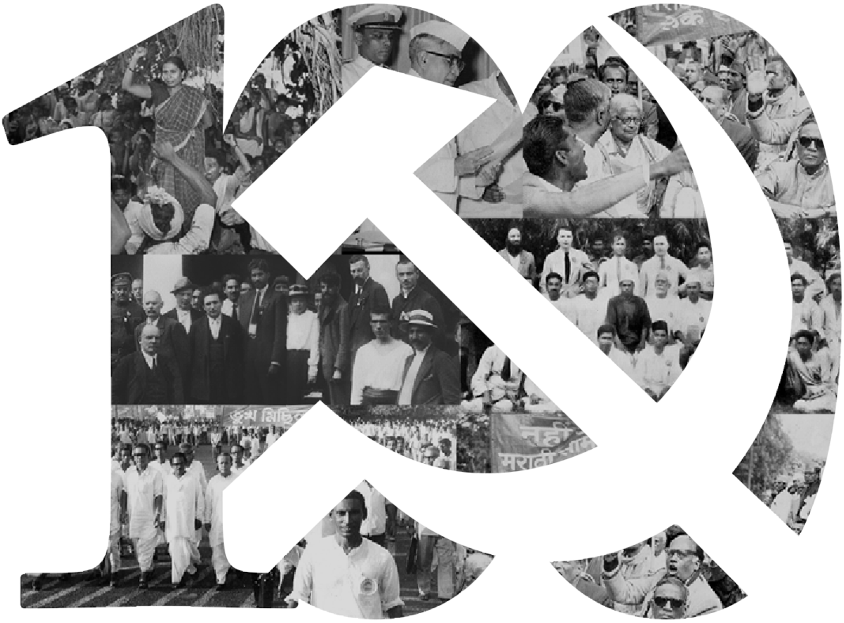

ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের একশো বছর

Dossier no: 32
Tricontinental: Institute for Social Research
September 2020

ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের একশো বছর

Dossier no: 32 | Tricontinental: Institute for Social Research
September 2020

২০২০ সালের ১৭ই অক্টোবর ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলন পিছনে ফিরে দেখছে অত্যাচার, স্বৈরাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একটি শতক-কে । এই শতক ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের শতসহস্র বিপ্লবী’র আত্মত্যাগের শতক যারা নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে সমতাবাদী ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল। এই আন্দোলনের পথে চলতে গিয়ে হাজার হাজার কর্মী শহীদ হয়েছে আরও অজস্র মানুষ এখনও এই স্বপ্ন ও লড়াইকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, হিংসা, নিশ্চিহ্ন করে ফেলার অবিরাম অজস্র প্রচেষ্টার মুখোমুখি হয়েও ।

নিজেদের জীবন নিঃশেষ করে কমিউনিস্টরা তাঁদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে শক্তিসঞ্চার করে গেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে যাতে সমাজে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটানো যায়। তারা লড়াই করেছিল সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি, ধর্মীয় বিভেদ ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে, শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছিল যাতে তারা নিজেদের অধিকার বলবৎ করার জন্য লড়াই করতে পারে, সমাজ যাতে প্রান্তিক, শোষিত, নিপীড়িত মানুষের বসবাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে তার জন্য সাধারণ মানুষের চেতনায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছে। কমিউনিস্ট আন্দোলন এ বিষয়ে অবগত যে - মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের সমাপ্তি ঘটতে পারে কেবলমাত্র একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে সমাজের উত্তরণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্যবাদ। আজও মানবতার সঙ্কটকালে এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে।

ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরা দেশপ্রেমিক; তাদের যাবতীয় চর্চা বা অনুশীলনের শিকড় গাঁথা রয়েছে ভারতের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার মাটিতে। যদিও এ-দেশে নিজেদের বিপ্লবী কর্মকান্ডকে তারা মানবমুক্তি ও স্বাধীনতার বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই মনে করেছিল। যে কমিউনিস্ট ভবিষ্যতের স্বপ্ন তারা লালন করে তার অংশীদার হিসেবে গোটা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে আরও অসংখ্য কমরেড এ বিষয়ে তারা সর্বদাই সচেতন ছিল । এ থেকে বোঝা যায় ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন বরাবরই ছিল আন্তর্জাতিক। অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী শোষিত মানুষ ও জাতিগুলির অধিকারের পক্ষে তারা সোচ্চার ছিল, এমনকি যখন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রচলিত জনমত তাদের এই অবস্থানকে সমর্থন করেনি তখনও।

তাছাড়া ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল অক্টোবর বিপ্লব (১৯১৭) – ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় যা কেবল জার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-কে সফল করেছে তাই নয় প্রত্যেক শোষিত জাতিকে পথ দেখিয়েছে। যে ভারতীয় বিপ্লবীরা ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল তাদেরই একটি দল পৌঁছে যায় তাশখন্দে যা তখন ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। এমএন রয় ছিলেন একজন ভারতীয় বিপ্লবী যিনি মেক্সিকান কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রতিষ্ঠাতা ও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। এম এন রয়ের সাহায্যে এই দলটি ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করে।

প্রবাসে প্রতিষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও, ১৯২০'র দশকের গোড়ার দিক থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা একাধিক কমিউনিস্ট গ্রুপের উত্থান ঘটছিল, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন বম্বেতে এসএ ডাঙ্গে, কলকাতায় মুজফফর আহমেদ, মাদ্রাসে এম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার এবং লাহোরে গুলাম হুসেন প্রমুখেরা। প্রবাসের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র কার্যকলাপ এই গ্রুপগুলিকে মার্ক্সিজম-লেনিনিজম বিষয়ক তাত্ত্বিক ও চর্চাগত শিক্ষাদান করত।

১৯২৫ সালের ২৫ থেকে ২৮শে ডিসেম্বর অধুনা উত্তর প্রদেশের কানপুর শহরে ভারতীয় কমিউনিস্টদের নিয়ে এক প্রকাশ্য সম্মেলনের আয়োজন করেছিল এম এন রায়ের ঘনিষ্ঠ কমিউনিস্টরা। এখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যার মুখ্য দপ্তর থাকবে বম্বেতে। এই হল ভারতের মাটিতে একটি সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম প্রচেষ্টা এবং ভারতীয় কমিউনিস্টদের একটি অংশ একেই ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা বলে চিহ্নিত করে।

১৯২০ সালে পেত্রোগ্রাদের ইউরিটস্কি প্যালেসে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে এম এন রয়(মাঝখানে, কালো টাই ও জ্যাকেট), ভ্লাদিমির লেনিন(বাঁ দিক থেকে দশম), ম্যাক্সিম গোর্কি(লেনিনের পিছনে) এবং অন্যান্য প্রতিনিধিরা।

ম্যাগাজিন ক্রাসনে প্যানোরামা (রেড প্যানোরামা)/উইকিপিডিয়া

গোড়ার দিকের বছরগুলি

ভারতীয় কমিউনিস্টরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে চেয়েছিল, তারা এমন একটি সমাজ গঠন করতে চেয়েছিল যেখানে শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের নিজস্ব ভবিতব্যের নির্ধারক হতে পারবে। এই উদ্দেশ্য যে বাস্তবেই পূরণ করা সম্ভব তার জলজ্যান্ত উদাহরণ হিসেবে তাদের সামনে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। তাদের উপরে ছিল সাংগঠনিক কাজের গুরুদায়িত্ব যার ফলে ১৯২০'র দশকের শেষের দিকে বিভিন্ন শহরের কেন্দ্রে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠল। ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সাল জুড়ে প্রত্যক্ষ করা গেল শ্রমজীবী মানুষের দ্বারা একের পর এক ধর্মঘট, তার সঙ্গে বম্বের কাপড়ের মিলের শ্রমিক ও বাংলার রেলওয়ে শ্রমিকদের দীর্ঘ লড়াই।

উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রামে কমিউনিস্টদের উত্থানের ফলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যারা তখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল তারাও মৃদু প্রতিরোধের রাস্তা থেকে সরে এসে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থানকে আরও জোরদার করতে বাধ্য হল। ১৯২১ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে দুই কমিউনিস্ট – মৌলানা হাসরত মোহানি এবং স্বামী কুমারানন্দ ব্রিটিশ শাসনের থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কংগ্রেস প্রস্তাবটি খারিজ করলেও মিটিং-এ এই প্রস্তাব উঠে আসা এবং তাকে কেন্দ্র করে গুরুত্ব সহকারে

আলোচনা একথাই প্রমাণ করে যে সে সময়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম কমিউনিস্ট ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করেছিল।

ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আদর্শের প্রসারে শঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশরা তাদের সাম্রাজ্যরক্ষার স্বার্থে তৎকালীন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে। ১৯২১ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে সেইসময়ের বহু গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিস্ট নেতৃত্ব গ্রেপ্তার হয়েছে এবং জেলে বন্দী থেকেছে। এই মামলাগুলির মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯-১৯৩৩)। কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে এই মামলা শুরু করা হলেও এই মামলাটিই হয়ে উঠল কমিউনিস্টদের মার্ক্সবাদী আদর্শ প্রচারের উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম। তারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করল আদালতের বিচারকক্ষে মার্ক্সবাদের তুখোড় বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে এবং মার্ক্সবাদের পক্ষে তর্ক করে, সাধারণ ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রবল আগ্রহ তৈরি হল এই সমস্ত কর্মকান্ডের ফলে। ৩৩ জন অভিযুক্তের মধ্যে ২৭ জনকে অপরাধী সাব্যস্ত করে দ্বীপান্তর বা কারাদন্ড দেওয়া হয়। ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টি ও সংযুক্ত সবকটি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং এর সদস্যপদ গ্রহণকে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করে। কমিউনিস্টরা গোপনে তাদের বিপ্লবী কার্যকলাপ চালু রেখে পার্টিকে আরও সম্প্রসারিত করে সদস্যসংখ্যা বাড়ানোর কাজ করে যেতে থাকল।

দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন বা মহামন্দা পুঁজিবাদী বিশ্বকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল, সেই মন্দার সময়েও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্য

পৃথিবীজুড়ে অসংখ্য মানুষকে সমাজতন্ত্র ও মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল। ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলেও কমিউনিস্টরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে কাজ করে চলেছিল, এর মধ্যে ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। তারা গোপনে পার্টির কাজ করে যাচ্ছিল এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে বহু অল্পবয়স্ক তরুণ তরুণীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এভাবে যারা সেসময়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই পরিবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব হয়ে ওঠে। এই বিভিন্ন ধরণের ফোরামগুলি যার মধ্যে একটি ছিল কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি বা সিএসপি (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি বামপন্থী গোষ্ঠী) এদের মাধ্যমে কমিউনিস্টরা অসংখ্য মানুষকে সংগঠিত করে শ্রমিক, ছাত্র এবং সাহিত্যিকদের বিভিন্ন গণ ও শ্রেণি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করার কাজে আত্মনিবেদন করে।

মিরাটে জেলের বাইরে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দোষী সাব্যস্ত পঁচিশ জন। পিছনের সারিতে (বাঁদিক থেকে ডান দিকে)ঃ কে এন সেহগাল, এসএস জশ, এইচ এল হাচিনসন, শওকত উসমানি, বিএফ ব্র্যাডলি, এ প্রসাদ, পি স্প্র্যাট,জি অধিকারি, মাঝের সারিতেঃ আরআর মিত্র,গোপেন চক্রবর্তী, কিশোরী লাল ঘোষ, এল আর কদম, ডিআর ঠেংড়ি, গৌরা শংকর, এস ব্যানার্জী, কেএন জোগলেকর, পিসি যোশী, মুজফফর আহমেদ। সামনের সারিতেঃ এমজি দেসাই,ডি গোস্বামী,আর এস নিম্বকর,এসএস মিরাজকার,এস এ ডাঙ্গে, এসভি ঘাটে, গোপাল বসাক।

***The Hindu* Archives**

গণসংগঠন ও শ্রেনি সংগঠনের উত্থান

আন্দোলনে অভিজ্ঞ ও পরিণত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টরা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের স্বার্থে শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছিল। ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থার কলকব্জাগুলি এবং তার সঙ্গে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কে অচল করে তোলার ক্ষেত্রে বিপ্লবী শ্রমিকরা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তারা তা বুঝতে পেরেছিল। কমিউনিস্ট কার্যকলাপের ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষ শ্রমজীবী মানুষের ধর্মঘটে উত্তাল হয়ে ওঠে যাতে অংশগ্রহণ করেছিল ৬০৬,০০০ সংখ্যক শ্রমিক।

শ্রমিক ছাড়াও জাতীয় আন্দোলনে দেশের ছাত্ররা, যুব সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার কথা ভেবে কমিউনিস্টরা বিপ্লব সংঘটিত করার উদ্দেশ্যে তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিল। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কমিউনিস্টরা বুঝতে পেরেছিল ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে জনসংখ্যার ৮০% কৃষিভিত্তিক সমাজে বাস করে সেখানে জাতির যথার্থ মুক্তিলাভ কেবল তখনই সম্ভব যখন কৃষকদের একটা বড় অংশকে সংঘবদ্ধ করা যাবে। এভাবেই কমিউনিস্ট আন্দোলন – যা গোড়ার দিকে মূলত শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছিল – তা ক্রমশ ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই কমিউনিস্টরা ১৯৩৬ সালে বেশ কিছু গণ সংগঠন গড়ে তুললঃ অল ইন্ডিয়া কিসান সভা (এআইকেএস বা অল ইন্ডিয়া পেজন্ট ইউনিয়ন), অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন এবং প্রগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোশিয়েশন তার সঙ্গে ১৯৪৩ সালে তৈরি হল ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোশিয়েশন। কৃষিকাজের শ্রমিকদের প্রথম সংগঠনটিও তৈরি কমিউনিস্টদের দ্বারা। এই গণ সংগঠনগুলি ন্যায় ও অধিকার অন্বেষণ করতে থাকা সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে বিপ্লবী চেতনায় সংঘবদ্ধ করেছিল।

গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করার পরে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে গ্রামসমাজের গভীরে প্রোথিত ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল – বিশেষত বর্ণ ও শ্রেণির সংমিশ্রণ। গ্রামীণ ভারতীয় সমাজে জমিদার, মহাজন ও সরকারি আধিকারিকদের দ্বারা কৃষকের শোষণ ছিল প্রচলিত নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। খাজনা মিটিয়ে ও মহাজনদের ধার শোধ করবার পরে যে চাষীরা খাদ্যোৎপাদন করত তাদের কাছে নিজের পরিবারকে খাওয়াবার মত প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। ঋণের চক্রে ক্রমাগত আবর্তিত হওয়ার ফলে অনিবার্যভাবে কৃষকদের একটা বড় অংশ নিজের জমি হারিয়ে অন্যের জমিতে ভাড়ার বিনিময়ে চাষ করতে বাধ্য হত। জমিহীন কৃষকদের অবস্থা ছিল আরও খারাপ, মূলত তারা ছিল অস্পৃশ্য জাতভুক্ত এবং বাধ্যতামূলকভাবে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করতে হত – শারীরিক নিগ্রহ, বলপ্রয়োগ এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রথার মাধ্যমে তাদের এ কাজে বাধ্য করা হত এবং তাদের এই মনুষ্যেতর জীবনযাপনকে সামাজিক বৈধতা দেওয়া হত। গ্রামগুলিতে কমিউনিস্টরা যে

সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল অস্পৃশ্যতা এবং এই সমস্যাটিকে তাঁরা কম মজুরি এবং বাধ্যতামূলক শ্রম ইত্যদি সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করেন।

কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠল। কমিউনিস্ট নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া কিসান সভা'র সদস্যসংখ্যা ১৯৩৯সালের মে মাসে ছিল ৬০০,০০০, সংখ্যাটা এপ্রিলে বেড়ে হল ৮০০,০০০। কৃষক আন্দোলনের একগুচ্ছ দাবী ছিল যার মধ্যে ছিল জমিদার প্রথার উচ্ছেদ এবং চাষ করে যে কৃষক তার হাতে জমির মালিকানা দেওয়া , জোর করে কাজ করানো বন্ধ করা এবং জোর করে বর্গা চাষীদের থেকে জমিদার দ্বারা খাজনা আদায় বন্ধ করা, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমির পুনর্বন্টন, ভূমিকর প্রথার আমূল পরিবর্তন এবং ফসলের আরও ন্যায্য দাম।

কমিউনিস্টরা একদিকে কৃষকদের সংগঠিত করছিল, অন্যদিকে কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রকাশ্যেই বেশিরভাগ অঞ্চলে জমিদার এবং শাসকদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জমিদার শ্রেণি এবং তার সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপতিরা ছিল কংগ্রেসের সমর্থনকারী দুই স্তম্ভ। এর ফলে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশ এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে একধরণের সংঘাতের সম্ভাবনামূলক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস পরিচালিত প্রাদেশিক সরকার প্রকাশ্যে জমিদার ও পুঁজিপতিদের সমর্থন করত। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর চাপে সিএসপি নেতৃত্ব কমিউনিস্টদের বহিষ্কার করে। ইএমএস নাম্বুদিরিপাদ, অন্যতম প্রধান কমিউনিস্ট চিন্তাবিদ এবং কেরালার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী স্মৃতিচারণা করে বলেছেন এই ঘটনার পরে 'সিএসপির

কিছু রাজ্য জেলা ও স্থানীয় ইউনিট (কেরলায় সিএসপির সকল সদস্য) সম্পূর্ণত সিএসপি থেকে সিপিআইতে রূপান্তরিত হয়েছিল।’

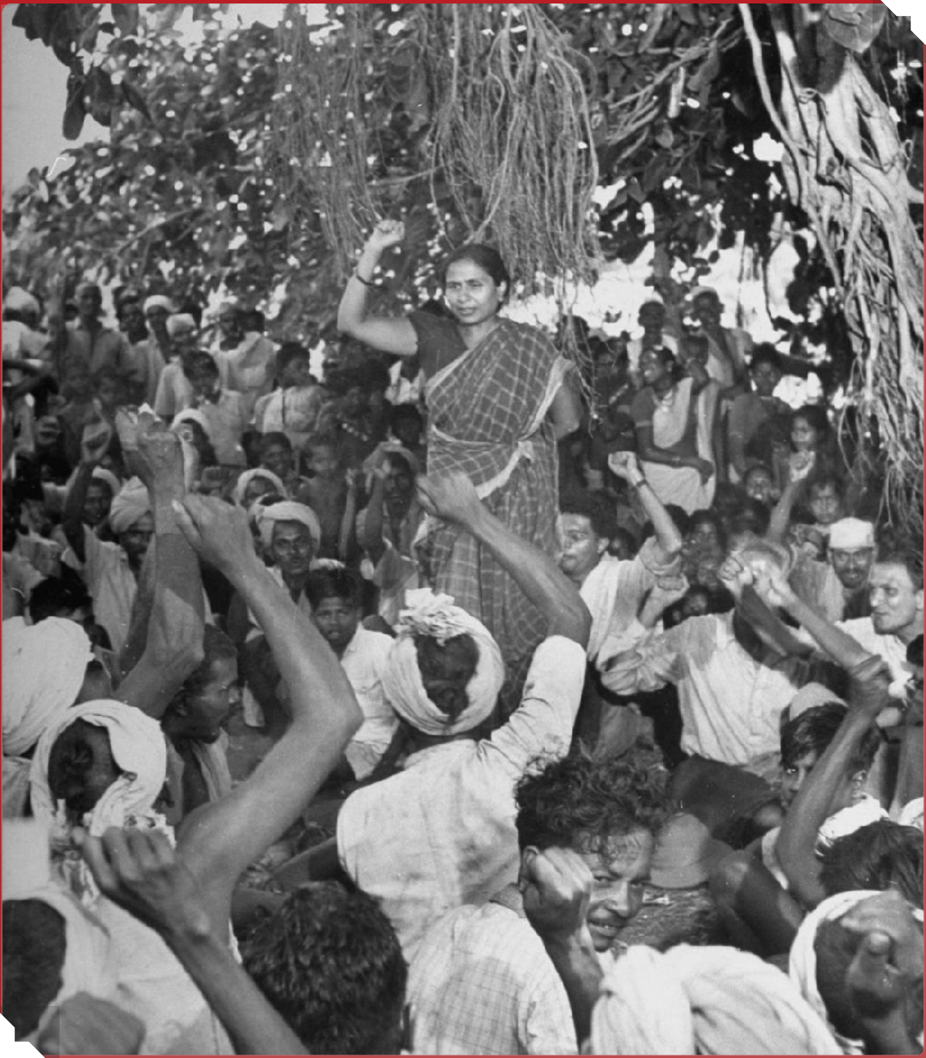

আনুমানিক ১৯৪৬ সালঃ কমিউনিস্ট আন্দোলন ও অল ইন্ডিয়া কিসান সভার নেত্রী গোদাবরী পারুলেকর অধুনা মহারাষ্ট্রের থানেতে ওয়ারলি আদিবাসীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছেন। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিসান সভার নেতৃত্বে ওয়ারলি বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ১৯৪৫ সালে।

মার্গারেট বোর্ক-হোয়াইট/ দ্য হিন্দু আর্কাইভস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই ব্রিটেন ভারতবর্ষকে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠতে বাধ্য করেছিল। যুদ্ধের ফলে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দাম প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের জনগণকে তীব্র কষ্ট দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়। সিপিআই কঠোরভাবে এই যুদ্ধের বিরোধীতা করেছিল এবং গণ প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিল। ব্রিটিশ সরকার গণ গ্রেপ্তার শুরু করে; ১৯৪১ সালের মে মাসের মধ্যে প্রায় সমগ্র সিপিআই নেতৃত্ব কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

কিন্তু ১৯৪১ সালের ২২শে জুন নাৎসি জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনলে যুদ্ধের চরিত্রে বদল ঘটে, এই যুদ্ধ আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ সকল মানুষের যুদ্ধে পরিণত হয়। প্রোলেতারিয়ান ইন্টারন্যাশনালিজম সব কটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে ডাক দেয় কারণ ‘এটা স্বীকার করা প্রয়োজন যে হিটলারের ফ্যাসিবাদই হল প্রধান শত্রু এবং ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ইউএসএসআর যে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে বিশ্ব বিপ্লবের ভিত্তিকে রক্ষা করার স্বার্থে সেই যুদ্ধে সকল মানুষকে জয় লাভ করতেই হবে’ (‘সকল পার্টি সদস্যদের উদ্দেশ্যে পাঠানো সিপিআই পলিট ব্যুরোর রেজোলিউশন, পার্টি লেটার নং ৫৬ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৪১’)।

কংগ্রেস ব্রিটিশদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আপোষ করার চেষ্টা করছিল- ব্রিটিশরা কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে সম্মত হয়েছিল, ক্ষমতা-হস্তান্তরের কথাও বলা হয়, তবে সেটা যুদ্ধ শেষ হলে তবেই। আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হয়। জাপানের বাহিনি ভারতের দিকে অগ্রসর হয়ে ব্রিটিশ অধিকৃত সিঙ্গাপুর, বার্মা, মালয় এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নিলে জাপানীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। যাই হোক, দীর্ঘ সময় ধরে যে কংগ্রেস ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করে আসছিল তারা এসময়ে ব্রিটিশদের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য ঔপনিবেশিক শাসকদের ভারত ছাড়তেই হবে এই দাবীতে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু করল।

কমিউনিস্টরা অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির ভারত ছাড়ো প্রস্তাবের বিরোধীতা করেছিল। কমিউনিস্টরা মনে করেছিল গোটা বিশ্ব যখন ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তখন এই প্রস্তাব সময়োচিত নয়, এবং মিত্রশক্তি কোনও কারণে দুর্বল হয়ে পড়লে সমগ্র ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধপ্রচেষ্টা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে এই কথা ভেবে তারা উদ্বিগ্ন বোধ করেছিল। কিন্তু জনগণ ঔপনিবেশিক শক্তিকে ছুঁড়ে ফেলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল এবং এক্ষেত্রে এদেশে কমিউনিস্টদের অবস্থান সেসময়কার সর্বসাধারণের মনোভাবের বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে কমিউনিস্ট পার্টি তার তৎকালীন অবস্থানের পর্যালোচনা করেছিল। এই পর্যালোচনার থেকে সিদ্ধান্তে

উপনীত হওয়া গিয়েছিল যে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ে সাধারণ মানুষের মনোভাবের বিরুদ্ধে যাওয়া একটি গুরুতর ভুল পদক্ষেপ ছিল। সিপিআই স্বীকার করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জনগণের যুদ্ধকে সমর্থন জানানোর পাশাপাশি কমিউনিস্টদের উচিত ছিল এদেশের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং ব্রিটিশ সরকার 'ভারত ছাড়ো' – তাদের এই ন্যায্য দাবীকে সমর্থন জানানো। কংগ্রেস ব্রিটিশদের উদ্দেশ্যে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিলেও তাদের নেতৃত্বের বেশিরভাগকেই অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রবল দমনপীড়নের মুখোমুখি হলে কীভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সে ব্যাপারে কংগ্রেস নেতৃত্বের কোনও আগাম পরিকল্পনা বা নির্দেশ ছিল না। আন্দোলনের প্রস্তাবকে সমর্থন না করলেও কমিউনিস্টরা জেলবন্দী কংগ্রেস নেতৃত্বের মুক্তির দাবীতে প্রচায় চালায় এবং ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট গঠনের দাবী জানায়।

১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল, ১৯৪২ সালে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। কমিউনিস্টরা জেল থেকে মুক্তি পায়। যুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪৩-১৯৪৪ -এ বাংলার ভয়াবহ মন্বন্তরে বাংলা,উড়িষ্যা,বিহার ও আসামে প্রায় ত্রিশ লক্ষেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। অর্থনীতিবিদ উৎসা পট্টনায়ক দেখিয়েছেন এই মন্বন্তর ছিল আসলে মুনাফা বৃদ্ধির জন্য ব্রিটিশদের সুপরিকল্পিত নীতি 'ভারতের জনসংখ্যার সামগ্রিক উপভোগ ও ব্যয় সংকোচন করিয়ে তাদের সম্পদকে দক্ষিণ এশিয়ায় জাপানের সঙ্গে

জোটশক্তির যুদ্ধখাতে আর্থিক যোগানে ব্যবহার করার জন্য’। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ ও বন্টনে কমিউনিস্টরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। পার্টি এসময়ে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী ও জমিদার যারা খাদ্যশস্য ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য গোপনে মজুত করে আটকে রাখছিল তাদের বিরুদ্ধে এবং এই শোষকদের মদত দেওয়া জনবিরোধী ব্রিটিশ সরকারের মুখোশ খুলে ফেলার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল। মহিলা আত্ম রক্ষা সমিতি সগঠিত হয়েছিল অল্পবয়সী মেয়েদের নারী পাচারকারীদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। ত্রাণ সরবরাহের জন্য স্বেচ্ছাসেবী দল ও মেডিক্যাল টিম তৈরি করে পাঠানো হচ্ছিল। এইসব অক্লান্ত পরিশ্রম ও কাজকর্মের জন্যই যুদ্ধচলাকালীন প্রচলিত জনমতের বিপরীত অবস্থান নিলেও কমিউনিস্টরা তাদের নিজস্ব শক্তি এবং জনসমর্থন ধরে রাখতে সফল হয়েছিল এবং পার্টির প্রসার ঘটেছিল।

চিত্তপ্রসাদের ‘হাংরি বেঙ্গল’-এর একটি পৃষ্ঠা। বইয়ের কপিগুলি ব্রিটিশরা বাজেয়াপ্ত করে এবং পুড়িয়ে ফেলে; এই ছবিটি একটি মাত্র বেঁচে যাওয়া কপি থেকে গৃহীত (ডিএজি মডার্ন, নিউ দিল্লি দ্বারা ফ্যাক্সিমিলিতে পুনর্মুদ্রিত, ২০১১)। চিত্তপ্রসাদের আঁকা বাংলার দুর্ভিক্ষের ছবিগুলি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা পিপলস ওয়ারে ছাপা হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও জনমত গঠন করার উদ্দেশ্যে।

যুদ্ধ-পরবর্তী অভ্যুত্থান

যুদ্ধ পরবর্তী সময়কালে ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ করল একাধিক গণ আন্দোলন, যার মধ্যে বেশ কয়েক্টির নেতৃত্বে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। যুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টি শক্তিসঞ্চার করেছিল এখন সেগুলি গণ আন্দোলনের পরিণত হল।

পঞ্চাশ থেকে সত্তর লক্ষ শ্রমিকের ছাঁটাই, জীবনযাপনের খরচ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার প্রতিবাদে এবং তার সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলার ডাকে সাড়া দেওয়া শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামে দেশ উত্তাল হয়ে উঠল। শ্রমজীবী মানুষের এই বিশাল কর্মকান্ডের মধ্যে ছিল ১৯৪৬ সালের পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে শ্রমিকদের ধর্মঘট। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভি (আরআইএন) – এর সৈন্যদের (নিম্নপদস্থ আধিকারিক) বিদ্রোহ একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা। বম্বের বিদ্রোহী নৌ-সেনারা ধর্মঘট করে এবং লাল পতাকাসহ জাতীয় আন্দোলনের অন্যান্য দলগুলির পতাকা উত্তোলন করে। তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের বন্দী করে। সিপিআই সম্পূর্ণভাবে এই অভ্যুত্থানকে সমর্থন করে ১৯৪৬ এর ২২শে ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। সারা দেশ জুড়ে কয়েকশো হাজার শ্রমিকরা

ধর্মঘটে যোগ দেয়, দোকানদাররা দোকানপাট বন্ধ রেখেছিল এবং ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করেছিল। শেষ পর্যন্ত ২৩শে ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহী নৌ-সেনারা আত্মসমর্পণ করে; যদিও কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলন ও বিদ্রোহীদের পক্ষে বিপুল জনমত তৈরি হওয়ার ফলেই সম্পূর্ণভাবে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যায়নি।

এই সময়কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকরা সংগঠিত হচ্ছিল। সিপিআই সর্বত্র দাবী করতে থাকে যে বহু শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের গ্রামগুলি যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণের শিকার হয়ে চলেছে তার অবসান ঘটাতে হবে। কিছু জায়গায় আন্দোলন কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিদ্রোহের চেহারা নেয়। অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা,তামিলনাড়ু,কেরলা,মহারাষ্ট্র থেকে বাংলা,অসম,ত্রিপুরা এবং কাশ্মীর পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক কৃষক নারীপুরুষরা সংঘবদ্ধ হয়। এই আন্দোলন শাসক শ্রেণির ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল, আন্দোলন দমন করার জন্য শাসকরা চরম হিংসার পথ বেছে নেয়। শেষ পর্যন্ত কৃষকরা যে দাবীগুলির জন্য লড়াই করছিল তার অনেকগুলি আদায় হয় এবং এর ফলে আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

বম্বেতে সিপিআই-এর হেড কোয়ার্টারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো মিটিং-এ বিটি রনদিভে, জি অধিকারি এবং পিসি জোশী, ১৯৪৫

সুনীল জানাহ/ দ্য হিন্দু আর্কাইভস

তেভাগা আন্দোলন

১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল অব্দি অল ইন্ডিয়া কিসান সভার ব্যানারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত তেভাগা আন্দোলন ছিল বাংলার বৃহৎ কৃষক আন্দোলন। জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের মাত্র অর্ধেক ভাগ পেত ভাগচাষীরা, বাকিটা যেত জমির মালিকের হাতে। তেভাগা আন্দোলনের দাবী ছিল যে ভাগচাষীদের তিন ভাগের দু ভাগ ফসল দিতে হবে এবং ভাড়া কমাতে হবে। 'তেভাগা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'তিন ভাগ', যা ফসল তিন ভাগে ভাগ করে দুই ভাগ ভাগচাষীদের দেওয়ার দাবীর কথা বোঝায়। এই আন্দোলন যে সময়ে সংগঠিত হচ্ছিল সেসময়ে কলকাতা আর পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। কিন্তু তেভাগা আন্দোলন শ্রেণি সংগ্রামের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পেরেছিল, যেসব জায়গায় কিসান সভার প্রভাব ছিল সেই জায়গাগুলি ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গামুক্ত। পুলিশের হাতে যে ৭৩ জন আন্দোলনকারী নিহত হয় তাদের মধ্যে ছিল হিন্দু মুসলিম ও আদিবাসী নারী ও পুরুষ। বাংলায় মুসলিম লিগ শাসকের নির্মম দমন পীড়ন সত্ত্বেও বিভিন্ন অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ভাগচাষীদের অধিকারের দাবীগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১। দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্প্রদায়িকতা অর্থে বোঝানো হয় একটি নির্দিষ্ট আইডিয়াকে- ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি হল রাজনৈতিক সম্প্রদায় যাদের পরস্পর বিরোধী অ-ধর্মীয় স্বার্থ রয়েছে। যেসমস্ত রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িকতার দর্শন গ্রহণ করে তাদের সাম্প্রদায়িক দল বলা হয়; 'সাম্প্রদায়িক হিংসা' এবং 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা'র মত শব্দবন্ধগুলি সাম্প্রদায়িক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে সংঘটিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সংঘর্ষকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রাম

তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সংগঠিত সর্ববৃহৎ অভ্যুত্থান। এই আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তেলেঙ্গানায় যা সেসময়ে ছিল হায়দ্রাবাদের অন্তর্ভুক্ত একটি তেলুগু ভাষী অঞ্চল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতবর্ষে এমন কয়েকশো এলাকা ছিল যা সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের আওতাভুক্ত ছিল না। এই এলাকাগুলি ব্রিটিশদের অধীনস্থ সামন্তপ্রভুদের দ্বারা শাসিত হত। হায়দ্রাবাদ ছিল এমনই একটি দেশীয় রাজ্য যার শাসক ছিল নিজাম। নিজামের স্বৈরাচারী শাসন এবং জমিদারদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে তেলেঙ্গানা আন্দোলন সংগঠিত হয়। অন্যায্য করব্যবস্থা বিলোপ করার দাবী এবং ভেট্টি'র (বলপূর্বক শ্রমদানে বাধ্য করা) বিরুদ্ধে ও জমিতে যেসব কৃষকরা চাষ করেন তাদের জন্য চুক্তিপত্রের দাবীতে এই আন্দোলন শুরু হয়। কমিউনিস্টদের মাধ্যমে আন্দোলন যত তীব্র হয়ে উঠল ততই রাজাকার এবং পুলিশ বাহিনী তাদের উপর অত্যাচার, হিংসা নামিয়ে আনল, তাদের হত্যা করতে শুরু করল। এর ফলে গড়ে উঠল সশস্ত্র প্রতিরোধ। সশস্ত্র সংগ্রাম যখন চরম রূপ নিয়েছে তখন প্রায় ৩০০০ টি গ্রাম সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিল আন্দোলনকারীরা যার মোট অধিবাসীদের সংখ্যা তিন লক্ষেরও বেশি। এই আন্দোলনের ফলে এক লক্ষ জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টিত হয়। জোর করে কাজ করানোর প্রথার বিলোপ ঘটে, শ্রমিকদের দৈনিক পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পায়, ন্যূনতম পারিশ্রমিক ধার্য হয়। এই গ্রামগুলিতে সাধারণ মানুষের দ্বারা স্ব-পরিচালিত কমিটির

মাধ্যমে শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিষেবা চালু হয়।

কংগ্রেস সরকার এই কমিউনিস্ট পরিচালিত আন্দোলনকে দমন করার জন্য ও নিজাম-কে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর 'পুলিশ অ্যাকশন' নামিয়ে আনে। নিজাম আত্মসমর্পণ করে এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কেবল হায়দ্রাবাদের দখল নেওয়াই যথেষ্ট ছিল না। এরপর ভারতীয় সৈন্য গ্রামগুলিতে মার্চ করে প্রবেশ করে কৃষকদের আন্দোলন ভেঙে দেবার জন্য। জমি পুনর্দখল করার জন্য জমিদার এবং নিজামের ভূতপূর্ব আঞ্চলিক প্রশাসকরা ভারতীয় সৈন্যদল ও পুলিশের সঙ্গে গ্রামগুলিতে ফিরে আসে । বিভিন্ন জায়গায় মানুষ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলেও প্রায় ৪,০০০ কমিউনিস্ট এবং আন্দোলনকারী কৃষক এই অভ্যুত্থানে নিহত হয় এবং ১০,০০০-এরও বেশি মানুষকে ডিটেনশন ক্যাম্প ও জেলে বন্দী করে রেখে ৩-৪ বছর ধরে নির্যাতন চালানো হয়।

মল্লু স্বরাজ্যমসহ (বাঁ দিকে) তেলাঙ্গানা সশস্ত্র আন্দোলনের (১৯৪৬-১৯৫১) অন্যান্য সদস্যরা

সুনীল জনহ/ প্রজাশক্তি পাবলিশিং হাউস

পুন্নাপ্রা-ভায়লার অভ্যুত্থান

১৯৪৬ সালে পুন্নাপ্রা আর ভায়লার, কেরালার আলাপ্পুঝা জেলার দুটি গ্রাম ত্রিবাঙ্কুরের স্বৈরাচারী রাজার শাসন ও তার প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা বৃহৎ আন্দোলনের এপিসেন্টারে পরিণত হয়। হায়দ্রাবাদের মত ত্রিবাঙ্কুরও ছিল একটি দেশীয় রাজ্য। এখানকার শাসকেরা স্বাধীন ভারতবর্ষে যোগ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে তাঁরা চাইছিলেন শাসনকার্য পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত একজন রাষ্ট্রপতিসহ 'আমেরিকান মডেল'টি অবলম্বন করতে।ত্রিবাঙ্কুরের শাসকরা নির্বাচিত সভা বা সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এমন সরকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে সম্মত না হওয়ায় এবং 'আমেরিকান মডেল' অবলম্বন করতে চাওয়ায় এর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির মানুষ কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সক্রিয় হয়ে ওঠে। শ্রমিক ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ বাঁধে। ২৪শে অক্টোবর থেকে ২৭শে অক্টোবরের মধ্যে পুলিশের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় কয়েকশো শ্রমজীবী মানুষ। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী অপদস্থ হয়ে ত্রিবাঙ্কুর ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ত্রিবাঙ্কুরের ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী বাস্তবায়িত হয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে কেরালার ঐক্যবদ্ধ ভাষা রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতির সূচনা হয় মালয়ালম ভাষী অঞ্চলগুলির সংযুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে যথাঃ ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মালাবার জেলা যা সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের আওতাভুক্ত ছিল।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ প্রভেদসমূহ

১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আগে থেকেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে একাধিক প্রশ্ন উঠে আসতে শুরু করে। যে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে এতদিন ধরে কমিউনিস্টরা তীব্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল তা দূরীভূত হয়েছে। এখন ভারতীয়দের দ্বারাই দেশ শাসিত হচ্ছে। কিন্তু এই নতুন রাষ্ট্রের চরিত্র কী এবং কারা এই নতুন শাসক? নতুন ভারত রাষ্ট্র কি এক ঔপনিবেশিক শক্তির হাতের পুতুল? নাকি এ এক স্বাধীন রাষ্ট্র যার মূলে রয়েছে ভারতের কর্তৃত্বকারী শ্রেণিগুলির প্রতি সমর্থন? এই নতুন প্রেক্ষিতে ভারতের কর্তৃত্বকারী শাসক সম্প্রদায় হিসেবে কারা রয়েছে? এই নবনির্মিত রাষ্ট্র এবং শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্পর্কের প্রকৃতি কী রকম হবে? কমিউনিস্ট পার্টির কি নতুন শাসকদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে জোটবদ্ধ হওয়া উচিত? অথবা রাষ্ট্রব্যবস্থার উচ্ছেদের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেওয়া উচিত? 'রাশিয়া' অথবা 'চিন' কার পথ অনুসরণ করে এগোনো উচিত? নাকি কোনও ভারতীয় পথ রয়েছে? কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরে প্রধানত এই প্রশ্নগুলি ঘনীভূত হয়ে উঠছিল এবং পরবর্তীকালে এর ভিত্তিতে আন্দোলনের মধ্যে থেকে বিভিন্ন শাখা তৈরি হল।

১৯৫০ -এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই প্রভেদগুলি তীব্রতর হয়ে উঠল। আশু জিজ্ঞাসা ছিল স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জওহরলাল নেহেরুর দ্বারা পরিচালিত ভারত সরকারের নীতিগুলিকে কীভাবে বিশ্লেষণ করা হবে সেই ব্যাপারে। সরকার একটি অপেক্ষাকৃতভাবে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করছিল; এর ফলে ইকোনমিক প্ল্যানিং-এর পদ্ধতির সূচনা হয়; কংগ্রেস এমনকি এও দাবী করে যে তাদের উদ্দেশ্য হল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। সিপিআই-এর একটি অংশ মনে করে যে কমিউনিস্টদের কংগ্রেসের অভ্যন্তরের বামপন্থী দলটির সঙ্গে কাজ করা উচিত সেসময়ে যার প্রতিনিধি ছিলেন জওহরলাল নেহেরু, এক্ষেত্রে যুক্তি দ্বারা বলা হয় এই দলটি জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিস্বরূপ এবং এরা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

এইসব তর্কবিতর্কের ফলে ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। যে অংশটি কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার পথে যাওয়ার বিরোধীতা করেছিল তাদের দ্বারা গঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সিস্ট) অথবা সিপিআই(এম); অপর অংশটির নাম রয়ে গেল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)।

১৯৬৯ সালে সশস্ত্র সংগ্রামের অপরিহার্যতায় বিশ্বাস রেখে অন্যান্য কমিউনিস্টরা প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট) অথবা সিপিআই (এমএল)।

বামপন্থী সরকার

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের সূচনা হল রাজ্য স্তরে কমিউনিস্ট পরিচালিত সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে।

নেশন হিসেবে ভারতবর্ষ গঠিত হয়েছে একাধিক ভাষাগত জাতিসত্তার দ্বারা এবং ভারতীয় রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা সাধারণ ভাবে বিভিন্ন ভাষাগত রাজ্যে বিভক্ত(যেমন, বাংলা ভাষা ভাষী মানুষদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ, তামিল ভাষাভাষী মানুষদের জন্য তামিল নাড়ু)। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসমূহের ভাষাভিত্তিক পুনর্বিন্যাসে কমিউনিস্ট আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের সময় এবং স্বাধীনতার পরে প্রথম দিকের বছরগুলিতে ভারতে রাজ্য বিভাজনে কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি ছিল না; ব্রিটিশরা কখন কীভাবে এক একটি অঞ্চল দখল করেছে তার ভিত্তিতে রাজ্যগুলিকে আলাদা করা হত। ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের উপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হত অনাঞ্চলিক ভাষা, তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক জীবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হত। ভারতবর্ষ একটি বহুভাষা সম্বলিত রাষ্ট্র যেখানে বহু ভাষা সংস্কৃতির গোষ্ঠী রয়েছে তাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে তারা ভারতীয় জাতির বৃহত্তর ঐক্যে অংশ নিয়েছে – এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কমিউনিস্টরা ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনকে সমর্থন করেছিল। তেলেঙ্গানা অভ্যুত্থান ও পুন্নাপ্রা-ভায়লার বিদ্রোহের মত আন্দোলনগুলি ভারতবর্ষে ভাষাভিত্তিক

রাজ্যগঠনের আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলেছিল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আগে ও পরে কিছু অঞ্চলে কমিউনিস্টরা কৃষকদের সফলভাবে সংগঠিত করতে পেরেছিল ফলে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলির মধ্যে কয়েকটিতে নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করার মত শক্তি তাদের ছিল। যদিও নিশ্চিতভাবেই জানা ছিল যে কেবলমাত্র নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার পরিচালনা করা শ্রমিকশ্রেণি ও কৃষকদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পথ নয়, তা সত্ত্বেও রাজ্যস্তরে সরকার পরিচালনার মাধ্যমে কমিউনিস্টরা বিকল্প নীতিগুলিকে তুলে ধরতে পেরেছিল এবং এও দেখাতে পেরেছিল কীভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করে একইসঙ্গে সাধারণ মানুষকে সাহায্য করা যায় এবং তাদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিতও করে তোলা যায়।

সেইসময়ে বম্বের মেয়র কমিউনিস্ট নেতা এসএস মিরাজকার-এর (ডানদিক থেকে তৃতীয়,কালো চশমা পরিহিত) নেতৃত্বে সাম্যুক্তা মহারাষ্ট্র সমিতির সদস্যরা নিউ দিল্লীতে সংসদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন, ১৯৫৮।

দ্য হিন্দু আর্কাইভস

কেরালা

অন্ধ্রপ্রদেশে কমিউনিস্ট পরিচালিত সরকার গঠনের প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হলেও, কেরালায় এল ঐতিহাসিক জয়। ১৯৫৬ সালে সার্বজনীন ভাষা মালয়ালমের ভিত্তিতে কেরালা রাজ্য গঠিত হয়। ১৯৫৭ সালে সিপিআই প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করল; ইএমএস নাম্বুদিরিপাদ ১৯৫৭ সালের ৫ই এপ্রিল প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন।

শক্তিশালী শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কেরালায় কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় এসেছিল। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে কৃষকদের কয়েক দশক ব্যাপী আন্দোলন চলেছিল, কৃষকদের থেকে জোর করে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করা হত, উচ্ছেদ করা হত এবং সামাজিকভাবে অসম্মান করা হত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্টদের কর্মসূচীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভূমিসংস্কার। ১৯৫৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর ষষ্ঠ দিনে সিপিআই সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে এবং জমিদারদের দ্বারা ভাগচাষীদের উচ্ছেদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মন্ত্রীসভায় ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়ন করা হয় –কেরালা আগ্রেরিয়ান রিলেশনস বিল। এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলি ছিল চাষীদের হাতে জমির স্থায়ী মালিকানা দেওয়া, ন্যায্য কর ধার্য করা, জমির মালিকানায় ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া এবং ভাগ চাষীদের চাষ করা জমি ক্রয় করার অধিকার দেওয়া হয়।

কমিউনিস্ট সরকার শিক্ষাখাতে ফান্ড অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। গণতান্ত্রিক ক্ষমতায়ন, আরও ভাল কর্মযোগ্যতা, কাজের সুরক্ষা ও বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারসাধন করা হয়। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে প্রসারিত করা হয় এবং যাতে গরিব মানুষের সামর্থের মধ্যে চাল সরবরাহ করা যায় তার জন্য একাধিক ন্যায্য মূল্যের দোকান প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ভূমিসংস্কারের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি জমিদারদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং ক্যাথলিক চার্চের প্রধানরা শিক্ষাসংক্রান্ত সংস্কারগুলি পছন্দ করল না কারন তারা অজস্র বেসরকারি স্কুল চালাত। ক্যাথলিক চার্চ এবং প্রভাবশালী বর্ণের সংগঠনগুলি যাদের জমির মালিকানা সংক্রান্ত স্বার্থ ছিল তারা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কমিউনিস্ট মন্ত্রীসভার বিরোধীতা করতে শুরু করে। তারা একটি আন্দোলন শুরু করে হাস্যকরভাবে যার নামকরণ করা হয় বিমোচনা সমরম (‘লিবারেশন স্ট্রাগল’ বা মুক্তি সংগ্রাম)। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ১৯৫৯ সালে কেরালার কমিউনিস্ট মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়।

প্রথম কমিউনিস্ট মন্ত্রীসভা ভেঙে দেওয়ার পরে কংগ্রেস পরিচালিত সরকার ক্ষমতায় আসে, তারা ভূমি সংস্কার আইনটিকে দুর্বল করে দেয়। তা সত্ত্বেও ১৯৬৭-৬৯এর বামপন্থী সরকারের পরবর্তী আইন ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ এবং ১৯৭০-এর দশকের প্রথমার্ধে সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলনের ফলে ভূমিসংস্কার

কার্যকরী হয়েছিল যা পরবর্তী বছরগুলিতেও বজায় থেকেছে। ১৯২৩ সালের মধ্যে ২৮ লক্ষ ভাগচাষীকে অধিকার দেওয়া হয় বা তাদের অধিকার সুরক্ষিত করা হয় এবং ৬০০,০০০ হেক্টর জমি এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা অর্জন করতে পেরেছিল। ৫২৮,০০০- এরও বেশি সংখ্যক ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকদের ১৯৯৬ সালের মধ্যে বসবাসের জমি দেওয়া হয়।

কেরালার ভূমিসংস্কার প্রভাবশালী উচ্চবর্ণের জমিপ্রথার শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছিল, একটা বড় অংশের কৃষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটিয়েছিল এবং কৃষিজীবীদের ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত শর্ত নির্ধারণ করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাক্ষরতা ও স্বাস্থ্য সূচকে প্রবল উন্নতি হয়। ১৯৭০-এর মাঝামাঝি সময় থেকে অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার মাধ্যমে এই উন্নয়নগুলিকে সূচীত করা গেছিল যার ফলে ‘কেরালা মডেল’-এর ধারণাটির উত্থান হয়। কেরালা মডেলের মূল আদর্শগুলি হলঃ (১) একটি দেশ বা অঞ্চলের সমষ্টিগত জনসংখ্যার জীবনধারণের উপাদানগুলির সামগ্রিক উন্নতিবিধানে সফল হওয়ার জন্য সেই দেশ বা অঞ্চলের সম্পদশালী হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা আবশ্যিক নয়। (২) জনসাধারণ তাদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সরকারকে পুনর্বন্টনমূলক কাজ ও অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণে বাধ্য করতে পারে এবং পরিবর্তন সাধন করতে পারে, ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যেকেরালায় স্বাক্ষরতার হার সর্বোচ্চ এবং শিশুমৃত্যুর হার সর্বনিম্ন। একইসঙ্গে এই রাজ্যে মজুরির হার সর্বোচ্চ এবং শ্রমিকদের জন্য সুবিস্তৃত সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এইগুলি

সম্ভবপর করার ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের সুদৃঢ় আন্দোলনের ভূমিকা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ইএমএস নাম্বুদিরিপাদ(ডানদিকে) কেরালার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন। তিরুবনন্তপুরম, ৫ই এপ্রিল ১৯৫৭।

রাজন পোদুভাল/ দ্য হিন্দু আর্কাইভস

পশ্চিমবঙ্গ

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার দ্বারা সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে প্রদেশগুলি তাদের মধ্যে অন্যতম হল বাংলা। ঔপনিবেশিক কারনে যে দুর্ভিক্ষ হল তাতে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় এবং বাংলার কৃষকরা ছিল সারাদেশে সবচাইতে দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটি। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই দেশ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলঃ ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান। ব্রিটিশ শাসক ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল যাদের উদ্দেশ্য ছিল বিভাজনের দ্বারা ফায়দা লুটে নেওয়া তাদের প্ররোচনায় ধর্মীয় পরিচিতির বিভাজনে উগ্র হিংসা ছড়িয়ে পড়ল এবং শত সহস্র মানুষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রাণ হারাল। মানুষ দলে দলে পাকিস্তান থেকে ভারতে এবং ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে যেতে শুরু করলেন। বাংলা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল, পূর্ব বঙ্গ যুক্ত হল পাকিস্তানের সঙ্গে। এই হিংসা নৃশংসতা বন্ধ করার দাবীতে এবং উদ্বাস্তুদের বাসস্থান ও ভোটাধিকারের দাবীতে আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল কমিউনিস্টরা।

দুর্ভিক্ষ চলাকালীন কমিউনিস্টরা ত্রাণসংগ্রহ ও বন্টনের কাজ করেছিল। ১৯৫০-এ খাদ্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল যেখানে কলকাতার রাস্তায় ‘ভুখা মিছিল’-এ গ্রামের গরিব মানুষের স্রোত নেমে আসে। এই সমস্ত কর্মকান্ডের ফলে একটি বড় অংশের সাধারণ গরিব মানুষরা কমিউনিস্ট পার্টি’র সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হয়।

তেভাগা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায় গুলিতে ভূমিসংস্কারের দাবী কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫০-এর দশকে ভাগচাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কিসান সভা লড়াই করেছিল।

কমিউনিস্টদের শক্তি বৃদ্ধি তাদের নির্বাচনী কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয়। ১৯৬৭-১৯৬৯ এবং ১৯৬৯-১৯৭০ -এ কার্যকরী যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের অংশ ছিল সিপিআই(এম) ও সিপিআই। ১৯৭৭ সালে বাম ফ্রন্ট, সিপিআই (এম), সিপিআই, এবং অন্যান্য আরও কয়কটি বামপন্থী দলের জোট নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং সরকার গঠন করে যার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতি বসু। একটানা চৌত্রিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার পরিচালনা করেছে কমিউনিস্টরা।

যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের আমলে ভূমিসংস্কারের যে প্রক্রিয়া শুরু হয় বাম ফ্রন্ট সরকার সেগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। এই সরকার অপারেশন বর্গা চালু করে যার মাধ্যমে বর্গাদারদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়; যে বর্গাদাররা জমিতে চাষ করে তারা যাতে উৎপাদিত ফসলের পর্যাপ্ত ভাগ পায় তা নিশ্চিত করা হয়। জমির মালিকরা বর্গাদারদের ভাগবাবদ রসিদ দিতে বাধ্য হয় যাতে জমিতে বর্গাদারের অধিকারের প্রমানস্বরূপ এই রসিদ ব্যাংকে গৃহীত হয়। জমি মালিকানার একটি উচ্চসীমা বেঁধে দেওয়া হয় যার বাইরের জমিগুলি পুনর্বন্টিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বাম ফ্রন্টের ভূমিসংস্কার কর্মসূচী কতটা কার্যকরী হয়েছিল তা এই তথ্যটি থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র ভারতবর্ষে জমিবন্টন কর্মসূচীতে যত সংখ্যক উপকৃত হয়েছিল তার ৫০%-ইছিল কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে। ২০০৮ সালে ২৯ লক্ষেরও বেশি মানুষ জমিবন্টন ব্যবস্থার সুফল হিসেবে কৃষিজমি পেয়েছিলেন, ১৫ লক্ষেরও বেশি ভাগচাষী তাদের জমি নথিভুক্ত করাতে পেরেছিলেন এবং ৫৫০,০০০- এরও বেশি মানুষ বসবাসের জমি পেয়েছিলেন। তাছাড়াও কৃষিজমি প্রাপকদের মধ্যে ৫৫% ছিলেন দলিত (অস্পৃশ্য) ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত যারা ভারতীয় সমাজের দরিদ্রতম অংশের মানুষ।

পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পরিচালিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব হল রাজ্যের কৃষিব্যবস্থা ও গ্রামীণ জীবন ও জীবীকার পুনরুজ্জীবন ঘটানো। সেচব্যবস্থাসহ গ্রামবিকাশে পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে যেসব জমিতে বছরে মাত্র একবার ফসল হত সেখানে প্রতিবছর তিনবার ফসল উৎপাদন শুরু হয়। ভূমিসংস্কারের ফলে কৃষকরা নিজেরাও উৎপাদনক্ষম বিনিয়োগে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এই সমস্ত কিছুর ফলে পশ্চিমবঙ্গে কৃষিবৃদ্ধি'র হার উন্নত হয় এবং এই রাজ্য দেশের মধ্যে চাল উৎপাদনে অগ্রগণ্য হয়ে ওঠে।

যে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া বাম ফ্রন্ট সরকার শুরু করেছিল তার ফলাফল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলগুলিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়। তৈরি হয় পঞ্চায়েত এবং তাদের হাতে স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ভূমিসংস্কার প্রণয়ণের দায়িত্ব দেওয়া হল। রাজ্য সরকারের থেকে স্থানীয় স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে পর্যাপ্ত

ফান্ড দেওয়া হল। এই সংস্কারসাধনের ফলে গ্রামে শ্রেণি-ভারসাম্য কৃষকদের অনুকূলে গেল এবং বৃহৎ জমিদার, পুরনো জমিদার, মহাজনদের আধিপত্য অনেক কমে গেল। দলিত ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের অনুপাত জনসংখ্যায় তাদের অংশের চাইতে বৃদ্ধি পেল।

১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলনের ভুখা মিছিলে (‘প্রসেশান অফ দ্য হাংরি) হাঁটছেন জ্যোতি বসু যিনি পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

গণশক্তি

ত্রিপুরা

১৯৪৮ সালে ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পিপলস লিবারেশন কাউন্সিল (গণমুক্তি পরিষদ)। আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের গুরুত্বপূর্ণ দাবীগুলি যেমন বলপূর্বল শ্রমে বাধ্য করা, এবং সুদখোর মহাজনী ব্যবসা বন্ধ করার দাবীতে গণমুক্তি পরিষদ আন্দোলন সংগঠিত করে।

১৯৪৭ সালে ভারতভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে অসংখ্য উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় চলে আসে। পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ফলে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশক অব্দি এই অভিবাসন চলতে থাকে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ ও তাদের জমিতে এই অভিবাসনের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পূর্বে রাজ্যের প্রশাসন উদ্বাস্তুদের বিষয়ে উদাসীন ছিল। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে গণমুক্তি পরিষদ ও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে তার তাতে কয়েক দফা দাবীর কথা তুলে ধরা হয়ঃ আদিবাসী সম্প্রদায়ের জমির সুরক্ষা, উদ্বাস্তুদের যথাযথ পুনর্বাসন এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ভাগচাষীদের উচ্ছেদ বন্ধ করা। আদিবাসী ও অনাদিবাসী কৃষকদের সম্মিলিত সংগ্রাম কৃষকদের মধ্যে ঐক্য গঠন করেছিল।

১৯৭৮ সালে সিপিআই (এম)-এর নেতৃত্বে বাম ফ্রন্ট ত্রিপুরায় সরকার গঠন করে, মুখ্যমন্ত্রী হন নৃপেন চক্রবর্তী। বাম ফ্রন্ট সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে । এগুলির মধ্যে ছিল ভূমি সংস্কারকে সর্বাত্মকভাবে বাস্তবায়িত করা, এক্ষেত্রে আদিবাসীদের জমির বেআইনি হস্তান্তর বন্ধ করা, আদিবাসীদের জমি পুনরুদ্ধার, ১৯৭৯ সালে ভূমিসংস্কার আইনের সংশোধনের দ্বারা ভাগচাষীদের অধিকার সুরক্ষিত করা, ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের মধ্যে জমির পুনর্বন্টন – এই বিষয়গুলির উপরে জোর দেওয়া হয়। অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এডিসি) আইন পাস হয় ১৯৭৯ সালে যার লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং আদিবাসীদের আঞ্চলিক স্বশাসন দেওয়া। রাজ্যের অফিশিয়াল ভাষাগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় আদিবাসী ভাষা ককবরক।

১৯৮০'র দশকের গোড়ার দিক থেকে ত্রিপুরায় বিচ্ছিন্নতাবাদী অভ্যুত্থান এবং তৎসংক্রান্ত হিংসা'র উত্থান হয় যা ১৯৯০-এর দশক এবং ২০০০-দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চলেছিল। ২০০০- দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই অভ্যুত্থানের ফলে শারীরিক নিরাপত্তার অভাব ছিল রাজ্যের কাছে একটি বৃহৎ চ্যালেঞ্জ। তবুও, ২০০০-এর প্রথম দশকের শেষের দিকে বাম ফ্রন্ট সরকারের বহুমাত্রিক পন্থা অবলম্বনের ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিংসা যথেষ্ট হ্রাস পায়। এই পন্থায় গণ রাজনৈতিক প্রচার, বিচ্ছিন্নতাবাদ বিরোধী ব্যবস্থাগ্রহণ এবং আদিবাসী এলাকায় বিভিন্ন বিকাশমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

শান্তি পুনপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিকাশমূলক উদ্যোগগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং সাহিত্য,স্কুলশিক্ষা,স্বাস্থ্য, মাথাপিছু আয় ও গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণে ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য উন্নতিসাধন করে। আদিবাসীদের অধিকার সুরক্ষিত করা এবং তার সঙ্গে শ্রেণি বরাবর আদিবাসী ও অনাদিবাসী মানুষের ঐক্য এগুলিই ত্রিপুরার কমিউনিস্ট গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ উজ্জ্বলতম অংশ।

১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ সাল এবং এরপর আবার ১৯৯৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত পর্যন্ত ত্রিপুরায় বাম ফ্রন্ট ক্ষমতায় ছিল। ২০১৮ সালে রাজ্যের নির্বাচনে তাদের পরাজয় হয়। একদিকে বিনিয়োগ বয়কট ও কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকে উপর্যুপরি নয়াউদার নীতির চাপের সম্মুখীন হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকাঙ্ক্ষাকে উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়া ও অন্যান্য মাধ্যমে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ-পন্থী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ত্রিপুরায় বিপুল পরিমাণে অর্থব্যয় করেছিল। কমিউনিস্টদের উপরে দক্ষিণ-পন্থী শক্তিগুলি হিংসাত্মক আক্রমণ নামিয়ে আনে। নির্বাচনে পরাজয় হলেও ত্রিপুরায় কমিউনিস্টরা নিজেদের শক্তি ধরে রেখেছে এবং বিজেপি'র নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে।

নয়া উদারনীতিবাদের যুগ

১৯৯১ সালে ভারতবর্ষ আনুষ্ঠানিক ভাবে নয়া উদারনীতিবাদের যুগে প্রবেশ করেছে। যদিও এর আগেই ভারত জুড়ে বৃহৎ পুঁজিবাদীদের ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষমতা এবং নয়াউদারবাদের পথে এদেশ যে ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে তা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল। শিল্পের বেসরকারিকরণ, কম মূল্যে জনগণের সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া এবং শ্রমিকের অধিকার খর্ব করে দেওয়ার সরকারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা তীব্র লড়াই চালিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিউন ভেঙে যাওয়ার ফলে ভারত আরও দ্রুত আগ্রাসী পুঁজিবাদের পথে এগিয়ে গেছে। দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ও ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাওয়ার উন্মাদনা নয়া উদারনীতিবাদের হাত ধরেই এসেছে। এই শক্তিগুলিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এবং এর সঙ্গে রয়েছে বেশ কিছু সংসৃষ্ট দল যার মধ্যে রয়েছে এদের প্রধান রাজনৈতিক নির্বাচন মূলক অস্ত্র বিজেপি।

জাতীয় ক্ষেত্রে ১৯৯০-এর দশকে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি আঞ্চলিক দলগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দুটি স্বল্পকালীন জোট সরকারকে সমর্থন করেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে ভারতবর্ষের জাতীয় রাজনীতিতে কমিউনিস্ট প্রভাব সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছেছিল ২০০৪-২০০৭ সালে। এই সময়ে বিজেপি'র ক্ষমতায় আসা প্রতিহত করবার জন্য সিপিআই(এম), সিপিআই ও দুটি বামপন্থী দল – রেভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং অল ইন্ডিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক কেন্দ্রে কংগ্রেস পরিচালিত জোট

সরকারকে সমর্থন করেছিল। এই সময়কালে শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশা ঘোচাবার জন্যে গ্রামীন কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, তথ্যের অধিকার আইন(যার দ্বারা সরকারি কার্যকলাপে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়) এবং ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্টসহ (আদিবাসী ও অন্যান্য অরণ্যজীবীদের জমি ও অন্যান্য সম্পদে অধিকার সুনিশ্চিত করার প্রচেষ্টায়) বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু নয়া উদারনীতির ধাক্কাটা রয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত বাম দলগুলি সরকারের উপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় ২০০৮ সালে যখন ভারত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষর করে ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অভিমুখে অগ্রসর হতে শুরু করে।

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয় ২০০৭ সালে, পশ্চিমবঙ্গে। বামফ্রন্ট ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সমর্থনে জয়ী হয়। কিন্তু নয়া উদারবাদ একটু একটু করে অর্থনীতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করছিল ফলে রাজ্যগুলি তাদের স্বশাসনের ক্ষমতা হারাতে শুরু করে। রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় ফলত যেসব রাজ্য শ্রমিকের অধিকার সুনিশ্চিত করেছিল তারা বিনিয়োগ হারাতে শুরু করে। কেন্দ্রের সরকারগুলি ধারাবাহিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বৈষম্যমূলক পক্ষপাতিত্ব করেছে এবং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট, বেসরকারি ও বৈদেশিক বিনিয়োগ চলে সেইসব রাজ্যের হাতে যারা যথেষ্ট পরিমাণে কর ছাড় দিয়েছে ও শিল্পগুলিকে শ্রম আইন না মেনে চলার ছাড়পত্র দিয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় সবথেকে বেশি ভুক্তভোগী পশ্চিমবঙ্গ। ভূমিসংস্কারের ফলে

দ্রুতগতিতে যে উন্নয়ন হচ্ছিল এখন তা মন্থর হয়ে পড়ল এবং বিকল্প অনুসন্ধান করা আবশ্যকীয় হয়ে উঠল।

কিন্তু বাংলা ও দেশের অন্যত্র এখনও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে লড়াই চলছে। শহরাঞ্চলের অসংগঠিত ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমজীবীদের সংগঠিত করার কাজে কমিউনিস্টদের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ হয়েছে। সরকারি প্রকল্প ও কাপড়ের কারখানার মত নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে তারা সফল হয়েছে মহিলা গৃহ পরিচারিকা ও কৃষিজীবীদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে। স্থায়ী সাধারণ কর্মস্থলের অভাব ও গৃহ-ভিত্তিক কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি কমিউনিস্টদের কাজের সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব সত্ত্বেও এই পরিস্থিতিতে তারা শ্রমিকদের দ্বারা সফলভাবে কর্মসূচী সম্পাদনে সক্ষম হয়েছে।

এই লড়াইয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ হল বর্ণভেদ ও জাতিভেদ প্রথা, সাম্প্রতিক দশকগুলিতে এই সংক্রান্ত হিংসা কেবল বেড়েই চলেছে। কমিউনিস্টরা বর্ণবৈষম্যমূলক নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ভারতবর্ষে তাদের আন্দোলনের একদম গোড়া থেকে এবং এই লড়াই এখনও চলছে। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে এটি সম্ভবত সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি। ১৯৯০ দশকের শেষভাগ থেকে কমিউনিস্টদের দ্বারা একাধিক মঞ্চ তৈরি হয়েছে জাতিভেদ প্রথার বিলোপসাধনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। এই মঞ্চগুলি ঘৃণ্য সামাজিক প্রথাগুলির অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে শোষিত বর্ণের জমির অধিকার আদায় করার জন্য এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সদর্থক ভূমিকা

নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই সংগ্রামে ভারতের কমিউনিস্টরা বর্ণভিত্তিক শোষণ ও হিংসা , নারী নির্যাতন ও হিংসার বিরুদ্ধে ও সমস্ত নিপীড়িত শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য যতখানি বৃহৎ ও উন্মুক্ত একটি ফ্রন্ট তৈরি করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে নারীর উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দেওয়া ছাড়াও বাম-গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলন নারীর নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার স্বার্থে আইন প্রণয়ণের লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে যেমন সম্পত্তি ও বিবাহবিচ্ছেদে নারীর অধিকার। ধর্ষণ বিরোধী আইনে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের পটভূমি নির্মাণ করেছে লিঙ্গভিত্তিক হিংসা বিরোধী আন্দোলনগুলি। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বর্ণবৈষম্যমূলক নৃশংসতা ও অনার কিলিং-এর (জাতিভেদ প্রথার নিয়ম না মেনে আলাদা জাতিতে বিবাহ বা সম্পর্ক স্থাপন করলে তাদের হত্যা করা) বিরুদ্ধে লড়াই লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে, বিশেষত হরিয়ানায় কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক উওমেন্স অ্যাসোশিয়েশন-এর আন্দোলন।

হিন্দুত্ববাদী শক্তির (হিন্দুত্ব অর্থাৎ দক্ষিণ-পন্থী রাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদ) উত্থান এবং যেভাবে তারা সাম্প্রদায়িকতাকে চালিত করছে তা কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা মুক্তিসংগ্রামকে গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে এবং শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করছে। আরএসএস, বিজেপি এবং অন্যান্য ফ্যাসিবাদী ধাঁচের প্রতিষ্ঠানগুলি হিন্দু শ্রমজীবী শ্রেণির ক্রমবর্দ্ধমান বিচ্ছিন্নতাকে নয়া উদারবাদী নীতিসমূহের দ্বারা পরিচালিত করছে

হিংস্র সাম্প্রদায়িকতার আগুন ছড়িয়ে দেবার কাজে। এ সময়ে কমিউনিস্টরা একাই এই যুদ্ধে লড়ছে। যেখানে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল প্রত্যক্ষভাবে এই হিংস্র হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সরাসরি রুখে দাঁড়াবার পরিবর্তে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে সেখানে কমিউনিস্টরা অন্যান্য অ-ধর্মীয় ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির সঙ্গে বৃহত্তরভাবে জোটবদ্ধ হয়ে সামনের সারিতে থেকে ভারতবর্ষের সংখ্যালঘুদের জীবন ও অধিকার সুরক্ষিত করার স্বার্থে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

নয়া উদারনীতিবাদের জমানায় যেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণি পরিচিতি সত্তার রাজনীতির নামে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকর্তাকে নির্বাচন করছে সেখানে ভারতীয় কমিউনিস্টরা যাবতীয় ন্যায়সঙ্গত লড়াইয়ে সামনের সারিতে থেকেছে। রাষ্ট্র তার ক্রমবর্দ্ধমান নিপীড়ন ও দমনের সাহায্যে হয়ত অসংখ্য ভিন্নমত ও বিরোধী কন্ঠস্বরকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখতে পেরেছে কিন্তু কমিউনিস্টদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। কমিউনিস্ট আন্দোলন একথা উপলব্ধি করতে পারে যে সামনে যে লড়াই রয়েছে তা অত্যন্ত কঠিন এবং নিশ্চিতভাবেই এই লড়াইয়ে যোগ দিতে হবে উদ্দীপনা ও আশা নিয়ে।

ভারতের কমিউনিজম যা এই বছর ১০০ বছরে পা রাখল তা আসলে একটি অসম্পূর্ণ প্রোজেক্ট। এখনও অঘনীভূত এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল। নয়া উদারবাদের উত্থান তাকে দুর্বল করেছে কিন্তু তা নিজস্ব সীমাবদ্ধতা ও সুযোগ দুই বিষয়েই ওয়াকিবহাল। সমস্যা ও

সম্ভাবনাগুলিকে যদি সৎ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা যায়, বিদ্বেষ ও তিক্ততা বাদ দিয়ে, তাহলেই কেবল সামনে এগোবার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে; ভারতবর্ষের মানুষের জন্য এই পথই আবশ্যক। অন্য আর সবকিছুই হবে বর্বরোচিত।

অল ইন্ডিয়া কিসান সভা পরিচালিত আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাজস্থানের সিকরে কৃষকরা রাজস্থানের বিজেপি সরকারের নকল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালন করছে, ৩রা সেপ্টেম্বর ২০১৭।

অল ইন্ডিয়া কিসান সভা

tricontinental

Tricontinental: Institute for Social Research *is an international, movement-driven institution focused on stimulating intellectual debate that serves people's aspirations.*

www.thetricontinental.org

Instituto Tricontinental de Investigación Social *es una institución promovida por los movimientos, dedicada a estimular el debate intelectual al servicio de las aspiraciones del pueblo.*

www.eltricontinental.org

Instituto Tricontinental de Pesquisa Social *é uma instituição internacional, organizado por movimentos, com foco em estimular o debate intelectual para o serviço das aspirações do povo.*

www.otricontinental.org